

মুজলিমত

দ্বীন, কওম, যমীন

আসিফ আদনান



ত প চি হ

- | | |
|-----|-------------------------------|
| ১১ | যুগসন্ধির দায় |
| ৯৩ | খাঁচা |
| ১৬৫ | বুনিয়াদ |
| ২৩২ | অগ্রপশ্চাৎ |
| ২৬৬ | জিজ্ঞাসা |
| ৩৫৪ | দিকদর্শন |
| ৪৩০ | মুসলিমবঙ্গ: অস্তিত্বের নিয়তি |

যুগসন্ধির দায়

বাতের নগরীতে রাস্তাগুলো ফাঁকা। বাতাসে ধুলোর গন্ধ।
আবছা অন্ধকারের ভেতর দিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে দীর্ঘদেহী
পথিক। ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যাচ্ছে প্রধান রাস্তাগুলো। এই শহরের
মানুষ তার চেহারা খুব ভালো করে চেনে। কোথায় যাচ্ছে, তা কারও চোখে
পড়লে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।

কিন্তু উপায় নেই। আজ তাকে যেতেই হবে।

বহু বছর ধরে সে যা কিছুর জন্য কাজ করেছে, যা কিছু গড়ে তুলেছে তিলে
তিলে, সব আজ ধূলিসাৎ হবার উপক্রম। কেবল একজন মানুষের কারণে। এই
লোকের ভেতরে আসলে কী আছে, আজ সেটা জানতেই হবে। তারপর নিতে
হবে সিদ্ধান্ত।

সেজন্যেই আরামের বিছানা আর পছন্দের নারীর উষ্ণতা ফেলে রাস্তায় বেরিয়েছে
পথিক। আড়াল হিসেবে ব্যবহার করছে অন্ধকারকে।

পথিক নিয়মিত গতিতে এগিয়ে চলে।

বলতে বাধা নেই, মানুষটাকে সে পছন্দ করে না। হয়তো ঘৃণাও করে। তবে এসব
ছাপিয়ে মানুষটার ব্যাপারে আরেকটা অনুভূতি কাজ করে—সমীহ। ব্যাপারটা তার
পছন্দ না, কিন্তু বারবার চেষ্টা করেও এই অনুভূতি ঝেড়ে ফেলতে ব্যর্থ হয়েছে
সে।

একসময় তার মনে হতো মানুষটা বোকা। অতি সুবোধ, নিরীহ। প্রথম যখন সে তার বিচিত্র দাবি নিয়ে হাজির হলো, মনে হতো লোকটা উন্মাদ। কিন্তু এখন প্রায়ই মনে হয়, সে আসলে ধুরন্ধর।

কিন্তু পথিক নিশ্চিত হতে পারে না।

ছোটবেলা থেকেই লোকটার নাড়িনক্ষত্র এ শহরের সবার জানা। তবু মাঝেমাঝে তাকে খুব অচেনা মনে হয়। মানুষটার চোখ, চাহনি, চেহারা, কথা, আচরণ—সব কিছুর মধ্যে কী যেন আছে। যেন অন্য কোনো জগতের সাথে জুড়ে আছে সে।

কখনো কখনো তাকে খুব বেপরোয়া, খুব সাহসী মনে হয়। পুরো পৃথিবী যেন তার চোখে তুচ্ছ। আবার কখনো তার দিকে তাকালে মনে হয়, পুরো দুনিয়ার ওজন চেপে বসেছে তার দুই কাঁধে। চোখে কখনো বিষাদ, কখনো আনন্দ, কখনো ইম্পাতকঠিন দৃঢ়তা, কখন শান্ত সমুদ্রের গভীরতা।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় লোকটার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় পথিক। ছায়ার মতো নিঃশব্দে পৌঁছে যায় একেবারে কাছে। শুনতে পায় ভেতর থেকে ভেসে আসা মৃদু শব্দ।

কবিতা?

পথিক নিজেকে প্রশ্ন করে।

গভীর রাতে ঘরে বসে কবিতা পড়ছে সে? মুহূর্তের জন্য এক চিলতে বাঁকা হাসি ফুটে উঠে তার মুখে। আরও মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করে। তারপর ভেতর থেকে ভেসে আসা শব্দগুলো শুনতে শুনতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

জীবনে অনেক কবিতা শুনেছে পথিক। কবিতার সমঝদারির জন্য বিখ্যাত এই নগরী। দূরদূরান্ত থেকে কবিরা এখানে আসে। তাই কবিতা নিয়ে তার জ্ঞান একেবারে কম না। কিন্তু বাড়ির ভেতর থেকে আসা শব্দগুলোর মতো কোনো কিছু এর আগে সে শোনেনি।

পথিক নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে মূর্তির মতো। যখন সন্নিহিত ফেরে, ততক্ষণে কেটে গেছে বেশ অনেকটা সময়। নিজের অজান্তেই কখন যে চোখের কোণ ভিজে উঠেছে, টেরই পায়নি সে।

এতদিন ধরে মনের ভেতর উঁকিঝুঁকি দেওয়া চিন্তা আর শত চেষ্টায় আড়াল করে রাখা শঙ্কা এড়িয়ে যাবার উপায় থাকে না তার আর। তীব্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজেকে সত্যটা স্বীকার করার অনুমতি দেয় সে...

মানুষটা সত্য বলছে। এগুলো কোনো কবির কথা না। এগুলো কোনো মানুষেরও কথা না। হতে পারে না।

হতবিহ্বল হয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

অন্ধকারে নিজেকে আড়াল করে রাখা এই লোককে দেখে এখন কে বলবে, সে এই নগরীর অবিসংবাদিত নেতা? পুরো গোত্রের মধ্যে যে তার ক্ষুরধার বুদ্ধির জন্য বিখ্যাত? কে বুঝবে তার নাম আমার ইবনু হিশাম, কুরাইশ যাকে সম্মান করে ডাকে আবুল হাকাম, প্রজ্ঞার পিতা?

ইতিহাস অবশ্য এই পথিককে চিনবে অন্য এক নামে—আবু জাহল; অজ্ঞানতার পিতা। আর যে মানুষটা তাকে এই নামে পরিচিত করাবেন, সে রাতে তাঁর বাড়ির কাছেই গিয়েছিল আবু জাহল।

আবু জাহল কীভাবে হাটছিল, তার মনের ভেতরে কী চলছিল; ঐতিহাসিক সূত্র থেকে তা জানা যায় না। ওপরে যা লিখলাম, তার অনেকটাই আমার কল্পনা। তবে রাতের অন্ধকারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আবু জাহলের আড়ি পেতে কুরআন শোনার ঘটনা সত্য। ঐতিহাসিক সূত্রে এ ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়।

সীরাত ইবনু হিশাম থেকে জানা যায়, মক্কায় রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের বেলা তাঁর ঘরে সালাত আদায় করতেন। এক রাতে কুরাইশের কিছু নেতা তাঁর বাসার কাছে এসে গোপনে কুরআন তিলাওয়াত শুনছিল। এই তিন নেতা ছিল আবু সুফিয়ান, আখনাস আস-সাকারী এবং আবু জাহল।

তিনজন এসেছিল আলাদা আলাদাভাবে, কেউ কারও ব্যাপারে জানতো না। কিন্তু ভোরবেলা ফেরার সময় দেখা হয়ে গেল তাদের। বেশ বিব্রতকর অবস্থায় পড়ল কুরাইশ নেতারা। নিজেদের মধ্যে খানিকটা চোটপাটও হয়ে গেল। একে অন্যকে শাঁসালো, এমন যেন আর না হয়।

কিন্তু একই ঘটনা ঘটল পর দিন, আর তার পরের দিন আবারও।

প্রতিবারই ভোরবেলা বাড়ি ফেরার সময় তিনজনের দেখা হয়। প্রতিবারই তিনজন লজ্জা পায়, তারপর লজ্জা ঢাকতে হাকডাক করে একে অন্যের সাথে। শেষমেষ

তৃতীয় দিন তারা কসম করল, আর কখনো এমন করা যাবে না।

পর দিন সকালে আলাদাভাবে আবু সুফিয়ান আর আবু জাহলের কাছে গেল আখনাস। প্রশ্ন করল,

‘মুহাম্মাদের কাছে যা শুনলে, তা নিয়ে তোমার কী মত?’

আবু জাহলের উত্তর থেকে কুরআন এবং রিসালাত নিয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে ধারণা পাওয়া যায়। সে বলল,

‘আমরা (বানু মাখযুম গোত্র) আর বানু আব্দ মানাফ (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোত্র) দীর্ঘদিন ধরে মর্যাদা আর শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে প্রতিযোগিতা করছি। তারা মানুষকে খাইয়েছে, আমরাও খাইয়েছি। তারা বোঝা টেনেছে, আমরাও টেনেছি। তারা দান করেছে, আমরাও দিয়েছি। তারা যা করেছে সেটাতে পাল্লা দিয়েছি আমরা। আমরা ছুটছিলাম সমান তালে, যেন পাশাপাশি ছুটতে থাকে দুটো ঘোড়া।

হঠাৎ তারা বলে বসল, ‘আমাদের মধ্যে এমন এক নবী এসেছেন, যার কাছে আসমান থেকে ওহি আসে।’

এখন আমরা কীভাবে তাদের সমান হব?

আল্লাহর কসম! আমরা কখনোই তাঁর ওপর ঈমান আনব না; কখনোই তাঁকে সত্য বলে মেনে নেবো না।’^[১]

লক্ষ্য করুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ, তাঁর কাছে মহান আল্লাহর কাছ থেকে আসমানি বার্তা বা ওহি আসছে, এ কথার সত্যমিথ্যা নিয়ে আবু জাহল কিছু বলেনি। তার চিন্তা ছিল দুই গোত্রের মধ্যকার ক্ষমতা আর প্রভাবের রাজনীতি নিয়ে।

আরেকটা ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায় সাহাবী মুগীরাহ ইবনু শুবা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছ থেকে। ঘটনাটা তাঁর ইসলাম গ্রহণের আগের, আর এটা উল্লেখ করেছেন ইমাম আল-বায়হাকি। মুগীরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বক্তব্য অনেকটা এরকম:

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে প্রথম যখন আমার পরিচয় হয়, সেই দিন আবু জাহল আর আমি মক্কার এক ছোট গলি দিয়ে হাটছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমাদের দেখা হলো।

[১] ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়াহ (১ম খণ্ড), ইবনু কাসীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়াহ (১ম খণ্ড)

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু জাহলকে বললেন: ‘হে আবুল হাকাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে এসো। আমি তোমাকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করছি।’

আবু জাহল বলল: ‘হে মুহাম্মাদ! তুমি কি আমাদের ইলাহদের নিন্দা করা বন্ধ করবে না? তুমি কি শুধু এটুকুই চাও যে আমরা সাক্ষ্য দিই, তুমি তোমার বার্তা পৌঁছে দিয়েছ? বেশ, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, তোমার যা জানানোর ছিল তুমি জানিয়েছ। তুমি পৌঁছে দিয়েছ। আল্লাহর কসম! আমি যদি জানতাম তোমার কথা সত্য, তাহলে তো আমি তোমাকে অনুসরণই করতাম।’

রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে গেলেন। আবু জাহল তখন আমার দিকে ফিরল এবং বলল: “আল্লাহর কসম! আমি জানি, মুহাম্মাদ যা বলে তা সত্য। কিন্তু একটা জিনিস আমাকে আটকে রেখেছে।

বানু কুসাই (নবী ﷺ-এর গোত্র) দাবি করল, ‘কা’বার চাবি ও রক্ষণাবেক্ষণ আমাদের।’ আমরা বললাম: হ্যাঁ।

তারা বলল: ‘যমযম এবং হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব আমাদের।’ আমরা বললাম: হ্যাঁ।

তারা বলল: ‘পরামর্শ সভার দায়িত্ব আমাদের।’ আমরা বললাম: হ্যাঁ।

তারপর তারা বলল: ‘যুদ্ধের পতাকা আমাদের।’ আমরা বললাম: হ্যাঁ।

সব কিছু আমরা তাদের জন্য ছেড়ে দিলাম। তারপর আমরা ধীরে ধীরে এগোলাম, তাদের সাথে পাল্লা দিতে শুরু করলাম। (প্রতিযোগিতায় চলতে চলতে) যখন আমাদের দুই পক্ষের হাঁটুতে হাঁটু ঘঁষাঘঁষি লাগল এবং আমরা দুটো রেসের ঘোড়ার মতো (সমানে-সমান) হয়ে গেলাম, তখন তারা বলা শুরু করেছে, ‘আমাদের মধ্যে নবী আছে!’

এর সাথে তো পাল্লা দেওয়া সম্ভব না।

আল্লাহর কসম! এই জিনিস তো আমরা কখনোই অর্জন করতে পারব না। তাই আমরা কখনোই এটা (নুবুওয়াত) মেনে নেবো না।”^[২]

কথাগুলো লক্ষ্য করুন।

[২] ইমাম বায়হাকি, দালায়িলুন নুবুওয়াহ। অধ্যায়: আবু জাহল এবং অন্যদের দ্বারা নবী (সা.)-কে দেওয়া।

আবু জাহল জানতো মুহাম্মাদ ﷺ সত্য বলছেন। কিন্তু গোত্রীয় মর্যাদাবোধ, আর ক্ষমতার হিসেবনিকেশের কারণে এ সত্যকে সে অস্বীকার করল। কারণ মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবী হিসেবে মেনে নিলে তার গোত্র প্রতিযোগিতায় হেরে যাবে। হারাবে আধিপত্য।

সত্য জেনেও নবী-রাসূলদের প্রত্যাখ্যানের এই প্রবণতা অনেক পুরোনো। বিশেষ করে কুরআনে যাদেরকে ‘আল-মালা’ বলা হয়েছে—অর্থাৎ যারা সমাজের নেতা বা এলিট—তাদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশি থাকে।^[৩]

যুগে যুগে সামাজিক, রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, ব্যবসায়িক এবং ধর্মীয় এলিটরাই নবী-রাসূলদের (আলাইহিস সালাম) বিরোধিতা করে গেছে। আল-মালা বা এলিটদের এই ভূমিকার কথা বারবার এসেছে কুরআনের সূরা আ’রাফে।

এলিটরা বুঝত নবীদের দাওয়াহ তাদের গড়ে তোলা আধিপত্যের কলুষিত কাঠামোর জন্য হুমকি। তাই নবী-রাসূলদের বিরোধিতায় তারা থাকত সবার আগে।

হারানো সুযোগ

সেই রাতগুলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত শুনে আবু জাহলের চোখের কোণায় আসলেই পানি জমেছিল কি না, তা আমরা জানি না। তবে ব্যাপারটা আবু জাহলকে নাড়া দিয়েছিল, এটুকু মনে হয় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। তা না হলে বারবার ধরা পড়ার পরও কেন তিনদিন লুকিয়ে আসা?

আসলে ঐ মুহূর্তে চোখ ভিজে ওঠা অস্বাভাবিক কিছু না। পুরো প্রেক্ষাপট একবার চিন্তা করে দেখুন। একজন মানুষ নুবুওয়াত দাবি করছেন। বলছেন, সাত আসমানের ওপর থেকে জিবরীল আলাইহিস সালাম মহান আল্লাহর বাণী নিয়ে আসছেন তাঁর কাছে। দাবি করছেন, তিনি আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। আর গভীর

[৩] আল-মালা (الْمَالِ): শাব্দিক অর্থ ‘পূর্ণ করা’ বা ভরাট করা। পারিভাষিক অর্থ, কোনো সমাজের প্রভাবশালী শাসকচক্র, নীতিনির্ধারক বা ‘এলিট এস্টাবলিশমেন্ট’; যারা ক্ষমতা, সম্পদ ও আভিজাত্যের জোরে জনমত নিয়ন্ত্রণ করে। ইমাম আত-তাবারী তাঁর ‘জামিউল বায়ান’ তাফসীরে বলেছেন, আল-মালা হলো কওমের ‘আশরাফ’ (সম্ভ্রান্ত) ও ‘রুয়াসা’ (নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ), যাদের পরামর্শ ছাড়া সমাজে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না। ইমাম আল-কুরতুবির মতে, এরা এমন প্রভাবশালী গোষ্ঠী, যারা মজলিস ‘পূর্ণ’ করে রাখে এবং সংকটে তাদের দিকেই সবাই তাকিয়ে থাকে। কুরআনে এদের নবীদের প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। কারণ নবীদের দাওয়াত তাদের কায়েমি স্বার্থ ও সামাজিক আধিপত্যের জন্য সরাসরি হুমকি। আল-মালা সম্পর্কে সূরা আ’রাফ-এর প্রাসঙ্গিক আয়াতসমূহ: ৭:৬০, ৭:৬৬, ৭:৭৫, ৭:৮৮, ৭:১০৯, ৭:১২৭

রাতে তাঁর মুখে উচ্চারিত কুরআন শুনতে শুনতে আবু জাহল উপলব্ধি করছে, এই ব্যক্তি (ﷺ) সত্য বলছেন। তাঁর মুখে উচ্চারিত কুরআন কোনো মানুষের বানানো না। কোনো সৃষ্টির তৈরি না। এই কুরআন এসেছে আসমান ও যমীনের একচ্ছত্র অধিপতির কাছ থেকে।

আবু জাহল বুদ্ধিমান মানুষ ছিল। এই ঘটনার তাৎপর্য না বোঝার কোনো কারণ তার নেই। এই উপলব্ধির ভার, আর ঐ মুহূর্তে একজন মানুষের অনুভূতির তীব্রতটুকু একবার চোখ বন্ধ করে কল্পনা করার চেষ্টা করুন। এমন অবস্থায় চোখে পানি না আসাটাই আসলে অস্বাভাবিক।

তবে এই উপলব্ধি শেষ পর্যন্ত আবু জাহলের কাজে লাগেনি। সত্য জেনেও আবু জাহল তা অস্বীকার করেছিল। ঈমানকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

আবু জাহলের সামনে সুযোগ ছিল মহান হবার। সুযোগ ছিল স্থান-কাল-পাত্রের সীমানা অতিক্রম করে মহাকাব্যিক ইতিহাসের নির্মাতা হিসেবে নিজের নাম লেখাবার।

নবীজি ﷺ কুরাইশের দুই ব্যক্তির হিদায়াতের জন্য বিশেষভাবে দুআ করেছিলেন। একজন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু), আরেকজন আমার ইবনু হিশাম ওরফে আবু জাহল।^[৪]

প্রথমজন ইসলাম গ্রহণের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাহাবিদের একজনে পরিণত হন। অর্জন করেন মুসলিম উম্মাহর দ্বিতীয় খলীফা হবার মর্যাদা। তাঁর শাসনামলে ইসলামী খিলাফতের অধীনে চলে আসে অর্ধেক পৃথিবী। তাঁর হাতেই আসে বাইতিল মাকদিস, তথা পবিত্র জেরুসালেম শহরের চাবি। রাদিয়াল্লাহু আনহু।

অন্যদিকে আবু জাহল পরিচিত হয় ইসলামের সবচেয়ে কঠোর বিরোধী হিসেবে। নবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে শত্রুতায় সবচেয়ে তীব্র ভূমিকা নেয় সে। সব শেষে তার ছিন্নবিচ্ছিন্ন লাশ পড়ে থাকে বদর প্রান্তরের কালিব নামের কুয়াতে।^[৫]

আজ উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সমাদৃত। শুধু মুসলিমদের কাছে না, পুরো বিশ্বের কাছে। মার্কিন গবেষক মাইকেল সি হাট ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী ১০০ মানুষের তালিকায় প্রথমে রেখেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে। এ কথা অনেকেরই জানা। কিন্তু যে তথ্যটা অনেকে জানেন না, তা হলো এ তালিকায়

[৪] আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন: “হে আল্লাহ! আমার ইবনু হিশাম অথবা উমার ইবনুল খাত্তাব, এই দুই ব্যক্তির মধ্যে যে তোমার কাছে বেশি প্রিয়, তাকে দিয়ে ইসলামকে শক্তিশালী করো।” জামি আত-তিরমিজি, হাদীস: ৩৬৮১।

[৫] সহীহ বুখারি: ৩৯৮০, ৩৯৮১। আবু জাহলের লাশসহ অন্যান্য মুশরিক নেতাদের লাশ বদরের একটি পুরোনো ও পরিত্যক্ত কূপে ছুড়ে দেওয়া হয়েছিল।

মুসলিম উম্মাহর কেবল আরেকজনের নাম আছে, আর তিনি হলেন; আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নাম।

অন্যদিকে আবু জাহল আজ পরিচিত এই উম্মাহর ফিরআউন হিসেবে; যার গল্প বদরের দিনই শেষ। একজন বদরের কুয়ার নিচে হারিয়ে গেল। আরেকজন জেরুসালেমের দরজায় দাঁড়িয়ে ইতিহাস বদলে দিলেন।

ইসলাম গ্রহণ করার কারণে আবু জাহলের সামসময়িক আবু বাকর, উমার, উসমান, আলী, সা'দ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর মতো মানুষরা অল্প কিছু বছরের ব্যবধানে বিস্তীর্ণ ভূমির শাসক হয়েছিলেন। বিশ্বজুড়ে এমন সম্মান, মর্যাদা, ক্ষমতা আর নেতৃত্ব পেয়েছিলেন, যা জাহিলিয়াহর যুগে কুরাইশের পক্ষে চিন্তা করাও অসম্ভব ছিল।

আবু জাহল যোগ্য লোক ছিল। ইসলাম গ্রহণ করে দুনিয়াতে এই সম্মান ও মর্যাদার ভাগীদার হতে পারত সে। আখিরাতে পেতে পারত জান্নাত। কিন্তু তাওহীদকে অস্বীকার করে দুনিয়া আর আখিরাত সবই সে হারাল। আজ তার একমাত্র স্মারক তার একসময়কার বাড়ির জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল এক টয়লেট।

আবু জাহলের ভুল

আবু জাহলের ভুল কোথায় ছিল?

তার যুক্তিগুলো দেখা যাক।

আবু জাহলের কাছে তার গোত্র বানু মাখযুমের স্বার্থ ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পুরো বিষয়টাকে সে দেখছিল গোত্রীয় প্রতিযোগিতার জায়গা থেকে।

বহু বছর ধরে, মক্কাতে সবচেয়ে প্রভাবশালী অবস্থানে ছিল মুহাম্মাদ ﷺ-এর গোত্র। কিন্তু ধীরে ধীরে বানু মাখযুম তাদের সাথে পালা দিতে শুরু করে। মক্কা, কা'বা এবং হিজাবের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আবির্ভূত হয় তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে।

আবু জাহলের দৃষ্টিতে, এ অবস্থায় মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবী হিসেবে মেনে নেওয়ার অর্থ ছিল তাঁর গোত্রের আধিপত্য মেনে নেওয়া। হার মেনে নেওয়া। আবু জাহল হার মানতে রাজি ছিল না।

নবীজি ﷺ যা বলছেন, তা সত্য নাকি মিথ্যা, তার ভিত্তিতে আবু জাহল সিদ্ধান্ত নেয়নি। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেই সময়কার ক্ষমতার সমীকরণ আর রাজনীতির

জায়গা থেকে। তখনকার বাস্তবতার আলোকে আবু জাহলের এই অবস্থান যৌক্তিক, বাস্তবসম্মত। একজন বৈষয়িক, ঝানু রাজনীতিবিদ বা গোত্রপ্রধান যেভাবে চিন্তা করার কথা, আবু জাহল সেভাবেই ভেবেছিল।

আবু জাহল একা না। আরও অনেকে এভাবে চিন্তা করেছিল। কুরাইশের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং মুসলিমদের দ্বন্দের ব্যাপারে আরবের অধিকাংশ গোত্রের পলিসি ছিল: *ওয়েট অ্যান্ড সি; অপেক্ষা করো, দেখা যাক কে জেতে।* কুরাইশ যদি মুহাম্মাদ ﷺ-কে পরাজিত করে, তাহলে তো হলোই। আর যদি তিনি (ﷺ) বিজয়ী হন, তাহলে তখন তাঁর সাথে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। এমনটাই ছিল বেশির ভাগ গোত্রের অবস্থান।

হজের মৌসুমে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন গোত্রের কাছে দাওয়াহ নিয়ে যেতেন। বানু শাইবান নামের গোত্রের কাছে যখন গেলেন, তখন তারা বলল, ‘আপনি তো এমন কথা বলছেন যা রাজাবাদশাদের অপছন্দ। আরবরা আপনাকে আক্রমণ করলে আমরা সমর্থন দেবো, কিন্তু আযমীরা (পারসীয় কিংবা রোমানরা) আক্রমণ করলে আমরা সাহায্য করতে পারব না।’^[৬]

আরেক গোত্র বলল, ‘এই যুবক সাথে থাকলে পুরো আরবের ওপর আমরা রাজত্ব করতে পারব।’ কিন্তু তারা যখন জানতে চাইল, বিজয়ের পর ক্ষমতা তাদের হাতে থাকবে কি না, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, ‘কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।’ এ কথা শুনে তারা পিছিয়ে গেল।^[৭]

ভণ্ড নবী মুসাইলামা আল কাযযাবের যখন আবির্ভাব হলো, তখন তার গোত্র বানু হানিফা তাকে অনুসরণ করল। তাদের অনেকেই জানত মুসাইলামা ভণ্ড। তবু তারা তাকে মেনে নিল।

কেন?

বানু হানিফার এক বৃদ্ধ মুসাইলামার কাছে গিয়ে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল। সে বলেছিল:

‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি একজন মিথ্যাবাদী এবং মুহাম্মাদ সত্যবাদী।
কিন্তু মুদার গোত্রের সত্যবাদীর চেয়ে আমাদের রাবিয়া (বানু হানিফা)
গোত্রের মিথ্যাবাদী আমাদের কাছে বেশি প্রিয়।’^[৮]

[৬] আস-সীরাতুন নাবাবিয়াহ (ইবনু হিশাম), ১ম খণ্ড। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (ইবনু কাসীর), ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৭২-১৭৪।

[৭] পূর্বোক্ত

[৮] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনু কাসীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড

আবু জাহলের মতোই এরা সবাই চিন্তা করছিল সেই সময়কার সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোর আলোকে। আপাতদৃষ্টিতে তাদের অবস্থান ছিল যথেষ্ট যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত। কিন্তু দুই থেকে তিন দশকের মধ্যে, তারা সবাই ভুল প্রমাণিত হলো। শুধু তাই না, ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার কারণে তাদের উল্লেখযোগ্য অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আর যারা পরে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করল, শুরুর দিকের মুসলিমরা যে সম্মান ও মর্যাদা পেয়েছিল, তা থেকে তারা বঞ্চিত হলো।

কীভাবে হলো এত বড় মিসক্যালকুলেশন?

আবু জাহল চিন্তা করেছিল বিদ্যমান কাঠামোর ভেতরে। সেই কাঠামোর নিয়ম অনুযায়ী তার চিন্তা সঠিক ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ যে দাওয়াহ এনেছিলেন, তা সব কিছু ভেঙ্গেচুড়ে গুড়িয়ে দিল।

সমাজ ও রাজনীতির যেসব হিসেবনিকেশ আগে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হতো, অল্প কয়েক বছরের মধ্যে সেগুলো হয়ে গেল গৌণ কিংবা অপ্রাসঙ্গিক। মক্কাতে কুরাইশ গোত্রগুলোর ছোটখাটো প্রতিযোগিতার সীমানা ছাড়িয়ে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বজুড়ে। মুসলিমদের হাতে পরাজিত হলো সেই সময়কার দুই পরাশক্তি—রোম ও পারস্য। গড়ে উঠল হাজার বছরের এক অবিস্মরণীয় সভ্যতা।

আবু জাহল ছিল মানব ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণের এক সাক্ষী। কিন্তু সেই সময়কে চিনতে সে ব্যর্থ হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মহান আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন জাহিলি বিশ্বব্যবস্থা উৎখাতের জন্য। কিন্তু আবু জাহল সেই ব্যবস্থার মধ্যেই চিন্তা করছিল। খেলার নিয়ম বদলে যাচ্ছিল, কিন্তু আবু জাহলরা সেটা বুঝতে পারেনি। তারা খেলছিল পুরোনো নিয়মে।

আজ আমরাও ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ অতিক্রম করছি। আগের কিংবা পরের কোনো ঘটনাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নুবুওয়াতের সাথে তুলনা করার মতো না। তবে ইতিহাসের যে বাঁকে দাঁড়িয়ে আবু জাহলরা তাদের ‘বাস্তবসম্মত’ রাজনীতির হিসেব কষেছিল, আজ আমরাও দাঁড়িয়ে আছি অনেকটা একই রকমের এক বাঁকে। আর ভয়ের ব্যাপার হলো, আমরাও ঠিক একই ধরনের ভুল করার ঝুঁকিতে আছি।